Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ওমর ফারুক

রোলঃ 216011250

১৫ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ওমর ফারুক

রোলঃ 216011250

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ওমর ফারুক, আইডিঃ 216011250 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৫ জুন, ২০২৪ ইং

ওমর ফারুক

আইডিঃ 216011250

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা....5
বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত....5
ধৈর্য....6
ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত....6
মুমিনের জীবনে সবরের আবশ্যকতা....7
নবীদের সবর....9
ধৈর্য মহৎ গুণ কী শুধু আল্লাহ্ পদত্ত নাকি এটা অর্জন করা যায়....10
ধৈর্যের প্রকার....10
নবীদের সবর....13
সবরের পুরষ্কার....26

ভুমিকা

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় পরম করুণাময় এবং আল্লাহ আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর তার শান্তি বর্ষিত হক

বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের জন্য জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কিছু কল্যাণ প্রস্তুত রেখেছেন: তারা সর্বদা তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু আশীর্বাদ অনুভব করে, তারা তাদের পছন্দ বা অপছন্দের মুখোমুখি হোক না কেন। এবং আল্লাহ তার ফয়সালা ও ফয়সালাগুলোকে করেছেন যা তিনি আদেশ করেন এবং তাদের জন্য সম্ভব করেন এমন ব্যবসার মত যার দ্বারা তারা লাভবান হয়, অথবা পথ যা দিয়ে তারা তার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এই বাণীগুলো পাওয়া যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মণিমুক্তায় তিনি বলেন - আশ্চর্যজনক হল মুমিনের ব্যাপার আসলে তার সব ব্যাপারই ভালো আর সেটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। যদি তার মঙ্গল হয় তবে সে কৃতজ্ঞ হয় এবং তাই এটি তার জন্য মঙ্গলজনক; এবং যদি তার কোন ক্ষতি হয় তবে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং এটি তার জন্য কল্যাণকর। এ ধারণাটা মুমিন এর আল্লাহ্ প্রতি ঈমান বুঝায়। কিছু সালাফ উল্লেখ করেছেন যে, "ঈমানের দুইটি অংশ আছে - একটি অর্ধেক হল ধৈর্য এবং অন্যটি হল কৃতজ্ঞতা।" এটি মহান আল্লাহর বাণীর উপর ধারণা করে বলেছেন।

তিনি মহান আল্লাহ তাঁর কালাম এ পাক এর সূরা ইব্রাহিম আয়াত ৫ এর ইরশাদ করেন -

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ সকলের জন্য।

সালাফরা বলেন আল্লাহর বান্দা যদি সমগ্র দ্বীনকে বিবেচনা করে, তবে সে দেখতে পাবে যে এটি সম্পূর্ণরূপে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার দিকে ফিরে আসে।

বুঝা গেলো ধৈর্য একটি মহৎ গুণ যা দ্বারা রাব্বুল আলামিন সান্নিধ্য পাওয়া যায় কিন্তু কথা হলো ধৈর্য আসলে বা কী ?

ধৈর্য

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ ‘ সবর ' এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা , আটক থাকা ইত্যাদি । আরবিতে একটা অভিব্যক্তি আছে : “ অমুক সবরান (আটক অ নিহত হয়েছে । ” এর মানে সে বন্দী হয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছে। সবর বলতে বুঝায় দুঃখ ও উদ্বেগ এর সময় নিজেকে ও নিজের জিহবা সংযত রাখা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

কিছু আলিমগণ ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করেছেন , যার সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি । ধৈর্যবিনে মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয় ।

আমর ইবনু উসমান আল - মাক্কি (রাহমাতুল্লাহ) বলেন ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ- আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা । আল - খাওয়াস বলেন ধৈর্য বলতে কুরআন - সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা বোঝায় । আরেকজন আলিমের মতে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য । আর আলি ইবনু আবী তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো , যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না ।

দুঃখ - দুর্দশার সময়গুলোতে ধৈর্যশীল থাকার অবস্থা ভালো , নাকি এমন অবস্থা ভালো যাতে ধৈর্যের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না ?

কঠিন অবস্থার চেয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো । যেমনটা নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম/ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দুআতে পাওয়া যায় যখন তিনি তাইফ এর ভূমিতে গিয়েছিলেন ও সেখানকার মানুষ তাকে রক্তাক্ত করেছিলো তিনি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন দরবারে হাত তুলে আবেদন করেন যদি আপনে আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন , তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না । তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা ও সুখ - শান্তি আমি চাই ।
এটা সেই হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয় , যেখানে প্রিয় নবী বলেছেন কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কিছু দেওয়া হয়নি । কারণ এর থেকে বোঝা যায় , আমাদের ধৈর্যশীলতার পরিচয় মেলে দুর্দশায় পতিত হওয়ার পর কিন্তু সহজতাই শ্রেয় ।

মুমিনের জীবনে সবরের আবশ্যকতা

অনেকের ধারণা হচ্ছে ঈমান আনয়নের পর তারা মনে করে যে আমাদের ওপর আর কোনো বিপদ বা পরীক্ষা পতিত হবে না । সম্ভবত তাদের এই ধারণাটা তারা যা তাদের অন্তরের মধ্যে লালন করে এটি ভুল চিন্তা। বাস্তবিক পক্ষে তা অনেক কঠিন ও কষ্টদায়ক । দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে রাব্বুল আলামিন তার কালাম এ পাক এ ইরশাদ করেন -
যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য ; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম ? আর শুনি পরাক্রমশালী , বড় ক্ষমাশীল ।(সূরা মূলক আয়াত ২)

তাই দেখা যায় যুগে যুগে মহান আল্লাহ যে সকল নবী - রাসূল প্রেরণ করেছেন , তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আল্লাহ তায়ালা দুঃখ - কষ্ট , বিপদ - মুসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করেছেন ।

তেমনি মক্কার জীবনে যখন রাসূল (সা ঃ) ও তার সাহাবীদের ওপর একের পর এক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা বলেন -

আলিফ - লাম - মীম । মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে , আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না ? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি । ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন , কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন , কারা মিথ্যাবাদী । (সূরা আনকাবুত : ১-৩) শুধু মক্কার জীবনেই নয় বরং মদিনার জীবনেও যারা এরূপ ধারণা করেছিল কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে - তোমরা কি মনে করেছো , এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে ? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি । তাদের ওপর এমন কষ্ট - ক্লেশ ও বিপদ নেমে এসেছিল , যা তাদেরকে প্রকম্পিত করেছিল । এমনকি সমকালীন রাসূল ও তার সাথী ঈমানদার চিৎকার করে বলে উঠেছিল , কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ? অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই । (সূরা বাক্বারা : ২১৪)

যেমনি ভাবে রাব্বুল আলামিন পূর্ববর্তী সত লোক ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের উপর বালা মুসিবত এসেছে তেমনি ভাবে এখনকার মুমিনগণ কেউ আল্লাহ্ তালা পরীক্ষার সম্মুখীন করবে ।

এই কথাগুলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার কালাম এ পাক এ ইরশাদ করেন -

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয় , ক্ষুধা এবং জান - মাল ও ফলফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে । আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও । যারা , তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে , নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী । (সূরা বাক্বারা : ১৫৫-১৫৬)

অন্য আয়াতে মুমিনদের পরীক্ষার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে যেমন কুরআনে এসেছে- অর্থাৎ , অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন - সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে । আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে , তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা । আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর , তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ । (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)

পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুঃখ দুর্দশা মুহুর্তে আমাদের তিনি তাঁর কাছে

হে মুমিনগণ , ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও । নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন । (সূরা বাক্বারা : ১৫৩) এর জন্য অত্র আয়াত নাযিল করেছেন

চলো জেনে নেয়া যাক কিছু মহামানবদের জটিল মুহূর্তের ঘটনা

নবীদের সবর

কেবল আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানানো এবং এর সাথে ধৈর্যের কোনো বিরোধ নেই । কোনো কোনো নবির জীবনকাহিনি থেকে এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় । যখন ইয়াকূব (আঃ) তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তিনি বলেন - আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি । আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি , তোমরা তা জানো না । ” তার আগে ইয়াকুব বলেছিলেন : ' সাবরুন জামীল ' ; এর মানে আমার জন্য ধৈর্যই অধিক শ্রেয় । আর কুরআনেও আইয়ূব সম্পর্কে বলা হয়েছে : " স্মরণ করো আইয়ূবের কথা , যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই বলে যে) আমি দুঃখ - কষ্টে নিপতিত হয়েছি , তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । নবিজি -এর একটি দুআয় ধৈর্যের সারকথা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে -

হে আল্লাহ , আমি আমার দুর্বলতা ও সামর্থ্যের অভাবের ব্যাপারে আপনার কাছেই অভিযোগ জানাই । মূসা প্রার্থনা করেন -

“ হে আল্লাহ , প্রশংসা সকল তোমার ; অভিযোগ কেবল তোমার কাছে , আর একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই , ফরিয়াদ করি ; তোমার প্রতিই আমরা নির্ভর করি এবং তুমি ছাড়া অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ দেওয়ার কোনো শক্তি কারো নেই ।

লোকদের কাছে অভিযোগ করে বেড়ানো — এটা কথার মাধ্যমে সরাসরি প্রকাশ পেতে পারে আবার কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও হতে পারে — এই প্রকারের অভিযোগ ধৈর্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ ।

ধৈর্য মহৎ গুণ কী শুধু আল্লাহ্ পদত্ত নাকি এটা অর্জন করা যায়

যদি একজন লোকের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই ধৈর্য না থেকে থাকে , তাহলে সে যদি ধৈর্যশীলতার ভান ধরে এবং এভাবে ভান ধরে চলতে থাকে , তাহলে পরিণামে একসময় এটা প্রায় তার স্বভাবে পরিণত হবে । নবিজি -এর একটি হাদীসে আমরা এ কথার প্রমাণ পাই যে নিজে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন ।

ধৈর্যের প্রকার

আল্লাহর বান্দা যদি সমগ্র দ্বীনকে বিবেচনা করে, তবে সে দেখবে যে এটি সম্পূর্ণরূপে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার দিকে ফিরে আসে।

এটা এই জন্য কারণ ধৈর্য তিন প্রকার:-

এক নম্বর:- আল্লাহর আনুগত্যের কাজ সম্পাদনে ধৈর্যশীলতা। বান্দা আল্লাহর তার অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে একধরনের ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সংগ্রাম প্রদর্শন ছাড়া আদেশটি প্রায় পালন করে না। এভাবে তার ফরজ দায়িত্ব পালন ও সুপারিশকৃত এই ধৈর্য্য অনুযায়ী হয়।

উদহারন স্বরূপ - প্রচণ্ড গরম কিংবা শীতের প্রকোপ , যে অবস্থাই হোক না কেন , সারারাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আবার সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে তার ধৈর্য আছে এবং কাফির - মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে সে দুর্বল না।

দুই নম্বর :- নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাতে ধৈর্য। অবশ্যই আত্মা এবং তার প্রবণতা, শয়তানের প্রলোভন এবং খারাপ সঙ্গ সবই একজনকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ ও উৎসাহিত করে। তাই ধৈর্যের জোরে কেউ তাদের ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। কোন কোন সালাফ বলেছেন: "ভালো কাজ সৎকর্মশীল ও মন্দকারী উভয়ের দ্বারাই করা হয়, কিন্তু সত্যবাদী ব্যতীত অন্য কেউ পাপ ত্যাগ করতে সক্ষম নয়।

উদহারন স্বরূপ:- কোনো নারীর দিকে না তাকানো কিংবা দৃষ্টি অবনত রাখার ক্ষেত্রে তার ধৈর্য বড়ই আছে।

এমন লোক খুবই কম আজকের জামানায় যাদের মধ্যে উভয় গুণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় নম্বর :- পছন্দ ছাড়াই যার দ্বারা পীড়িত হয় তার প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। . এটি দুই ধরনের: -

১। এমন এক প্রকার যার উপর সৃষ্টির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন অসুস্থতা এবং অন্যান্য ধরণের ঈশ্বর প্রেরিত দুর্দশা; এই ধরনের বিষয়গুলি একজনের ধৈর্যকে সহজ করে তোলে কারণ সে তাদের মধ্যে আল্লাহর হুকুম ও ভাগ্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় এবং মানুষের কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই।তাদের এর ফলে, আল্লাহর একজন বান্দা ধৈর্য সহকারে তাকে বাধ্য করা হোক বা পছন্দ করা হোক।আল্লাহ যদি বান্দার হৃদয়কে দুঃখ-কষ্টের উপকারিতা এবং এতে যা কিছু অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ রয়েছে তার জন্য চিন্তার দরজা

খুলে দেন, তাহলে সে ধৈর্যশীল থেকে কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হওয়ার দিকে ফিরে যায়। সত্যিকার অর্থে, দুর্দশা একটি আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয় এবং তার হৃদয় এবং জিহ্বা উভয়ই ক্রমাগত ডাকতে থাকে: "হে আমার প্রভু! আমাকে আপনাকে স্মরণ করতে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং আপনার ভালভাবে উপাসনা করতে সাহায্য করুন।" 5 এই অবস্থাটি হয় শক্তিশালী বা দুর্বল হয়। আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার শক্তি ও দুর্বলতা। প্রকৃতপক্ষে, আমরা প্রায়শই এটি জীবনের বাস্তবতা খুঁজে পাই ।

২। এমন এক প্রকার যা তাকে তার সম্পদ, সম্মান বা স্ব-সম্মানে মানুষের হাতে পৌঁছে দেয়। এই ধরনের ধৈর্য সহ্য করা খুব কঠিন কারণ আত্মা ব্যথা অনুভব করে, এটি অপ্রতিরোধ্য হওয়া অপছন্দ করে এবং তাই এটি প্রতিশোধ নিতে চায়। ধৈর্য্য সহকারে এ ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নবী ও সত্যবাদী ছাড়া আর কেউ নেই।আমাদের নবী যখন ক্ষতিগ্রস্থ হতেন, তিনি বলতেন: "আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন! তিনি এর চেয়েও বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করেছিলেন!" এবং নবী লোকদের জানিয়েছিলেন যে অতীতের একজন নবীকে তার সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রহার করা হয়েছিল। এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না!" আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে তাঁর সাথে অনুরূপ কিছু ঘটেছিল এবং তিনি এভাবে (একটি দোয়া) বলেছিলেন। প্রার্থনায় তিনটি বিষয় একত্রিত হয়, যথা: তাদের (জালেমদের) ক্ষমা করা, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা করা। এই ধরনের ধৈর্যের শেষ পরিণতি হল বিজয়, সম্মান, সুখ, নিরাপত্তা ও শক্তির কারণ এই ধরনের ধৈর্যের শেষ পরিণতি হল বিজয়, সম্মান, সুখ, নিরাপত্তা ও শক্তি আল্লাহর ধৈর্যের নীতির কারণে, তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর (বান্দার) প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি তদনুসারে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার কালাম এ পাক বলেন:-

এবং আমি তাদের মধ্য থেকে আমাদের নির্দেশে পথপ্রদর্শনকারী নেতা তৈরি করেছি যখন তারা ধৈর্যশীল ছিল এবং [যখন] তারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল।

ধৈর্য ও দৃঢ়তার দ্বারা, একজন ব্যক্তি ধর্মে নেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়; যদি কেউ এই ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং বিশ্বাসের শক্তি যোগ করে তবে সে মহান আল্লাহর রহমতে সুখের স্তর অতিক্রম করবে।

চলো আমরা কিছু মহামানব এর জীবনী কিছু জটিল ও কঠিন মুহূর্তের ঘটনা অধায়ন করি

নবীদের সবর

হযরত নূহ (আ .) এর ধৈর্যধারণ হযরত নূহ (আ .) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্যতম এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে একজন । তিনি ছিলেন ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত । হযরত নূহ (আ .) নয়শত পঞ্চাশ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন । পুরো জীবন অর্থাৎ ৯৫০ বৎসর তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করেছেন । জীবনের প্রতিটি সময় তিনি তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন । কুরআন মাজীদে তার দাওয়াতের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- অর্থাৎ , সে বলল , ' হে আমার রব ! আমি তো আমার কওমকে রাত - দিন আহ্বান করেছি । ' অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে ' । * আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ' , তারা নিজদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে , নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে , (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে ' । (সূরা নূহ : ৫-৭) কিন্তু দুঃখের বিষয় হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া কেউই তার কথা শুনলো না । বরং তারা নিজেদের গোড়ামি আর অহংকারে অটল রইল । এভাবে আল্লাহর ধৈর্যশীল বান্দা হযরত নূহ (আ .) পঞ্চাশ কম হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন । তাদের সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা করেন । ধ্বংস ও শাস্তির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন । কিন্তু তারা তার এই মহৎ কাজের জবাব দেয় তিরস্কার , বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে । নূহ (আ .) তার নবুয়তি জীবনে তার কাওমের হাজার অত্যাচার , তিরস্কার , সত্ত্বেও ধৈর্যহারা হননি । বরং সবরের মাধ্যমে তিনি তাদের মোকাবেলা

করেছিলেন । আর আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে তার কাওমের দুষ্ট লোকদের থেকে মুক্তি দান করেন ।

ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহিম (আ .) । জীবনের প্রতিটি স্তরে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে । তারপরও তিনি সত্যের দাওয়াত থেকে বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি বরং ধৈর্যের সাথে প্রতিটি বিপদ মোকাবেলা করেছেন । দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইব্রাহিম (আ .) - এর ধৈর্যধারণ শুরু হয় তার পিতাকে দাওয়াত দানের মাধ্যমে । যিনি ছিলেন অগ্নি - পূজারক । যিনি ইব্রাহিম (আ .) কে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিলেন । অর্থাৎ , ' হে আমার পিতা , আমি আশঙ্কা করছি যে , পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে , ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে । ' সে বলল , ' হে ইবরাহীম , তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ ? যদি তুমি বিরত না হও , তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব । আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও । ' (সূরা মারইয়াম : ৪৫-৪৬) তার পিতার প্রাণনাশের হুমকিতে ইব্রাহিম (আ .) মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না এবং তার প্রতি কোনো ক্ষোভ ও দেখালেন না । বরং ধৈর্যের সাথে বললেন- ' তোমার প্রতি সালাম । আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল ' । ' আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা কর তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদত করছি । আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি ব্যর্থ হব না ' । (সূরা মারইয়াম : ৪৭-৪৮) ইব্রাহিম (আ .) তার জাতির লোকদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকলেন । কিন্তু কিছুতেই তার জাতির লোকেরা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হলো না । তখন ইব্রাহিম (আ .) তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত দেবতাদের ভেঙে দিলেন শুধু বড় মূর্তিটি ছাড়া । যখন লোকেরা এসে দেখলো যে , তাদের দেবতাদের অবস্থা লণ্ড - ভণ্ড তখন তারা ইব্রাহিম (আ .) কে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো : ইব্রাহিম তুমি কি আমাদের দেবতাদের সাথে এই ব্যবহার করেছ ? তখন ইব্রাহিম (আ .) বললেন : ওদের কেই জিজ্ঞেস করুন কে মেরেছে ওদের ? ঐ বড় মূর্তিটাকেই জিজ্ঞেস

করুন সেই ভেঙেছে কি না ? তারা বললো : ইব্রাহিম ! তুমি ভালো করেই জান দেবতাগুলো কথা বলতে পারে না । তখন ইব্রাহিম (আ .) বললেন : তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেন এমন সব জিনিসের পূজা - উপাসনা করো যেগুলো তোমাদের ভালো ও করতে পারে না , মন্দও করতে পারে না ? কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হলো না , তারা ইব্রাহিমের ব্যাপারে রাজার কাছে বিচার দিলেন । তখন ইব্রাহিমকে রাজার (নমরূদ) দরবারে আনা হলো । এবং আল্লাহর পয়গাম্বর ইব্রাহিমের সাথে বাকযুদ্ধ হলো । শেষ পর্যন্ত রাজা ও তার লোকেরা সিদ্ধান্ত নিলো ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে হত্যা করার । এ সম্পর্কে কুরআন বলছে-

অর্থাৎ , তারা বলল , ' তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর , যদি তোমরা কিছু করতে চাও ' । (সূরা আম্বিয়া : ৬৮) তারা একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ডলি বানালো এবং সেখানে এক জাতীয় ভারী কাঠ একত্রিত করলো । তারা একমাস ধরে সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে কাঠ এনে বিশাল এক স্তূপ বানালো । এরপর এতে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া হলো । সাতদিন পর্যন্ত এ আগুণ দাউদাউ করে জ্বললো । এরপর নমরূদ সেখানে ইব্রাহিম (আ .) নিক্ষেপের জন্য উপযুক্ত মনে করলো । আসলে এটা ছিল ইব্রাহিম (আ .) এর জন্য এক বড় পরীক্ষা । আল্লাহ তায়ালাও ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করতে চাইলেন । তিনি দেখতে চাইলেন ইব্রাহিম কি জীবন বাঁচাবার জন্য ঈমান ত্যাগ করে , নাকি ঈমান বাঁচাবার জন্য জীবন কুরবানি করে । কিন্তু ইব্রাহিমতো অগ্নিপরীক্ষার বিজয়ী বীর । তিনি তো কিছুতেই জীবন বাঁচাবার জন্য আল্লাহকে এবং আল্লাহর দ্বীনকে ত্যাগ করতে পারেন না । তিনি তো আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনকে নিজের জীবনের চাইতে অনেক ভালোবাসেন । কাফেরেরা তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে গেল । তিনি তাদের কাছে নত হননি । জীবন ভিক্ষা চাননি । জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের দ্বীন এবং ঈমান ত্যাগ করেননি । নিশ্চিত মনে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন । ওরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ করলো নিজেদের তৈরি করা নরকে । আল্লাহ ইব্রাহিমের প্রতি পরম খুশি হয়ে আগুনকে বলে দিলেন- • অর্থাৎ , আমি বললাম , ' হে আগুন , তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য । ' (সূরা আম্বিয়া :

৬৯) এভাবে আল্লাহর নির্দেশে আগুন ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গেল । আর ইব্রাহিম (আ .) তার ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন । স্ত্রী - পুত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা ইব্রাহিম (আ .) বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন , কিন্তু তার কোনো সন্তানাদি নেই । স্ত্রী সারাহ ছিলেন একজন বন্ধ্যা মহিলা । তার কোনো সন্তানাদি হতো না । ইব্রাহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন : অর্থাৎ , ' হে আমার রব , আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন (সূরা আস - সফফাত : ১০০) পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করেন । স্ত্রী হাজেরার ঘরে তার এক সুন্দর ফুটফুটে ছেলের জন্ম হয় । তিনি পুত্রের নাম রাখেন ইসমাঈল । বৃদ্ধ বয়সে শিশুপুত্রের হাসিতে তার মন ভরে ওঠে । কিন্তু এই পুত্রের ভালোবাসা নিয়েও আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেন । আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করে চান , তিনি পুত্রের ভালোবাসার চাইতে আল্লাহর হুকুম পালন করাকে বড় জানেন কি না ? আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ .) কে নির্দেশ দিলেন তার পুত্র ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কার জনমানব ও ফল পানি শস্যহীন মরুভূমিতে রেখে আসার জন্য । কিন্তু ইব্রাহিম যে আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন । তিনি যে জানেন আল্লাহর হুকুম অমান্য করা যায়না । তাই তো তিনি হাজেরা আর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হন । আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যান । হাজেরাকে বলে যান , আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাদের এখানে রেখে গেলাম । হাজেরাকে কিছু খাদ্য ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন । এভাবে প্রশান্ত সমুদ্রের মতো প্রশস্ত হৃদয় আর হিমালয়ের মতো অটল ধৈর্যশীল ইব্রাহিম আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় বিজয়ী হলেন ।

কেবল আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানানো এবং এর সাথে ধৈর্যের কোনো বিরোধ নেই । কোনো কোনো নবির জীবনকাহিনি থেকে এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় । যখন ইয়াকূব (আঃ) তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তিনি বলেন - আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি । আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি , তোমরা তা জানো না । ” তার আগে ইয়াকুব বলেছিলেন : ' সাবরুন জামীল ' ; এর মানে আমার জন্য ধৈর্যই অধিক শ্রেয় । আর কুরআনেও আইয়ূব সম্পর্কে বলা হয়েছে : " স্মরণ করো আইয়ূরের কথা , যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই বলে যে)

আমি দুঃখ - কষ্টে নিপতিত হয়েছি , তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । তেমনি আল্লাহ্ তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আঃ) কেও অনেক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন যেমন ছোট বেলায় চুরির অপবাদ ও তার সৎ ভাইদের ষড়যন্ত্র তাকে কুল e ফেলে ডেয়ে ও তার তা থেকে রক্ষার পর তাকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া ও তাঁর যৌবনে মহা পরীক্ষা তাকে এক মন্ত্রী পরিবার কিনে নেয় এরপর হযরত ইউসুফ (আ .) মিসরের এক মন্ত্রীর পরিবারে রাজপুত্রের সমাদরে বড় হতে থাকেন । এখানেই তিনি পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হলেন । তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়্যত দান করেন । তখনকার মিসরের লোকদের নৈতিক চরিত্র ছিলো খুবই খারাপ । তাদের নারী - পুরুষ সবাই নির্লিপ্তের মতো পাপ করে বেড়াতো । কেউ পাপ করলে অন্যরা সেটাকে খারাপ বলে মনে করতো না । ইউসুফ (আ .) যেমন ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ঠিক তেমনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠ যুবক । সেই মন্ত্রীর স্ত্রী ও অন্যান্য শহুরে মহিলারা ইউসুফকে চারিদিক থেকে পাপ কাজে লিপ্ত করার জন্য ফুসলাতে থাকে । মন্ত্রীর স্ত্রী জুলেখা এক পক্ষীয়ভাবে ইউসুফের সাথে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে । কুরআন এ ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে এভাবে- আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো , আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি । আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল , সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল , ' এসো ' । সে বলল , আল্লাহর আশ্রয় (চাই) । নিশ্চয় তিনি আমার মনিব , তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন । নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না । আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হলো , আর সেও তার প্রতি আসক্ত হতো , যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত । এভাবেই , যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দিই । নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । (সূরা ইউসুফ : ২২-২৪) আর ইউসুফ (আ .) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন ও ধৈর্যের পথ অবলম্বন করলেন । আর আল্লাহ তায়ালা তাকে সে অবস্থা থেকে রক্ষা করলেন । কারাগারের জীবন ইউসুফ (আ .) দেখলেন এই মহিলাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই । তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন এই বলে- অর্থাৎ , সে (ইউসুফ) বলল , ' হে আমার রব

, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে , তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয় । আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন , তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব ' । (সূরা ইউসুফ : ৩৩)আর আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন । ইউসুফ (আ .) কে কারাগারে প্রেরণ করা হলো । বালাখানা থেকে জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক করুণ অভিজ্ঞতা শুরু হলো ইউসুফের জীবনে । মনোকষ্ট , দৈহিককষ্ট সাথে সাথে স্নেহান্ধ ফুফু ও সন্তানহারা পাগলপারা বৃদ্ধ পিতাকে কেনানে ফেলে আসার মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে ইউসুফের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ । কেনানে ভাইয়েরা শত্রু , মিসরে জুলেখা শত্রু । নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই । তারপরও তিনি আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারালেন না । বরং তিনি পূর্ণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং জেলখানাতেই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করতে লাগলেন । যেমনিভাবে কুরআনে এসেছে- অর্থাৎ , ' হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয় , বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? ' (সূরা ইউসুফ : ৩৯) অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তার ধৈর্যের ফলে তাকে মিসরের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করলেন এবং তার প্রাণপ্রিয় পিতার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন । এতকিছুর পরও তিনি তার বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে খারাপ আচরণ করলেন না , বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন । যেমন কুরআনে এসেছে- তারা বলল , ' তুমি কি সত্যিই ইউসুফ ' ? সে বলল , আমি ইউসুফ । আর এ আমার সহোদর । আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন । নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে , তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না ' । তারা বলল , ' আল্লাহর কসম , আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন , আর আমরাই ছিলাম অপরাধী । সে বলল , ' আজ তোমাদের ওপর কোনো ভর্ৎসনা নেই , আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন । আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু । (সূরা ইউসুফ : ৯০-৯২) এভাবে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফকে তার ধৈর্যধারণের ফলে তাকে মর্যাদায় ভূষিত করলেন এবং তাকে প্রজ্ঞা , বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রশংসিত করেছিলেন।

আল্লাহ্ তার বান্দা মূসা (আঃ) পরীক্ষা করেছেন যখন তিনি ফেরাউন ঘরে বড় হচ্ছিলেন তখন তিনি একদা

তিনি দেখলেন জনমানবশূন্য রাস্তায় দুটি লোক মারামারি করছে । তাদের একজন ছিল বনি ইসরাঈল আর অন্যজন কিবতি । মূসা (আ .) কে দেখেই ইসরাঈলি লোকটি মূসার নিকট সাহায্য চাইলো । কিবতি লোকটি খুব বাড়াবাড়ি করছে দেখে মূসা (আ .) তাকে থামাতে গিয়ে একটা চড় মারলেন । মূসা (আ .) ছিলেন খুব শক্তিশালী । চড় খেয়ে কিবতি লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হলো । আসলে মূসা (আ .) লোকটিকে হত্যা করতে চাননি বরং তিনি তাদের মারামারি থামাতে চেয়েছিলেন । এ ঘটনায় মূসা (আ .) খুব লজ্জিত ও ব্যথিত হলেন । তিনি সাথে সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এই বলে- • অর্থাৎ , মূসা বলল , “ হে আমার রব , আপনি যেহেতু আমার প্রতি নিয়ামত দান করেন , তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না । (সূরা কাসাস : ১৭) আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ .) এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন । পরদিন সকালে ভয় ও শঙ্কা নিয়ে মূসা (আ .) ঘর থেকে বের হলেন । কারণ সরকারি লোকেরা চারদিকে কালকের হত্যাকারী কে খুঁজে বেড়াচ্ছে । মূসা (আ .) ভোর বিহানে চিন্তাগ্রস্ত মনে পথ চলছেন । কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায় । আবার সেই বনি ইসরাঈলি লোকটির সাথে দেখা । তখনও সেই লোকটি অন্য একটি কিবতি লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত । গতদিনের মতো আজও মূসা কে দেখে লোকটি মূসার সাহায্য চাইলো । তখন মূসা (আ .) বললো , তুমি তো দেখছি বড় বিভ্রান্ত লোক এ বলে তিনি তাকে ধমক দিলেন । ধমক খেয়ে ইসরাঈল লোকটি মনে করলো মূসা বুঝি তাকেই মারতে আসছে । ফলে সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো : মূসা তুমি কি আজ আমাকেও সেভাবে হত্যা করতে চাও , যেভাবে কাল একজনকে হত্যা করেছিলে ? তুমি তো দেখছি বড় স্বৈরাচারী সংশোধনকামী নও । একথা শুনার সাথে সাথে কিবতি লোকটি দে ছুট । এক দৌড়ে সে ছুটে এলো ফেরাউনের কাছে । সে বলে দিল কালকের লোকটিকে মূসা হত্যা করেছে এবং সে বনি ইসরাঈলের লোক । আর যায় কোথায় ? ফেরাউন তার রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দিল যেখানে পাও মূসাকে ধর এবং তাকে হত্যা কর । রাজার এ নির্দেশ

শুনার সাথে সাথে মূসা (আ .) এর এক ভক্ত প্রাসাদের কর্মকর্তা মূসা (আ .) নিকট আসলো এবং বললো : মূসা দেশের কর্তারা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে । তুমি এখনি ফেরাউনের রাজ্য ছেড়ে চলে যাও । খবরটা শুনেই মূসা (আ .) পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন । ইতিপূর্বে যেহেতু তিনি রাজপুত্রের ন্যায় জীবন যাপন করেছেন , তাই এই সফর তার নিকট খুবই কঠিন ছিল । এজন্য তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন এই বলে-অর্থাৎ , আর যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে রওনা করল , তখন বলল , ' আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন ' । (সূরা কাসাস : ২২) সীমান্ত প্রহরীদের হাতে যেন ধরা না পড়েন , সে জন্যে খুব সতর্কভাবে সীমান্ত পার হলেন । একাধারে আট দিন হাঁটার পর মাদইয়ানের নিরাপদ এলাকায় এসে সবরের পুরস্কার পৌছলেন । তখন তিনি খুবই ক্লান্ত - শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি গাছের ছায়ার নিচে বসে পড়েন । মিসর থেকে মাদইয়ান পর্যন্ত তিনি দৌড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলেন । তাই তার পায়ে ফোসকা উঠে গিয়েছিল । খাওয়ার কোনো দ্রব্য তার সাথে ছিল না । গাছের পাতা , ঘাস ইত্যাদি তিনি ভক্ষণ করেছিলেন । পেট তার পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল । ঐ সময় তিনি আধখানা খেজুরেরও মুখাপেক্ষী ছিলেন । এ সময় মূসা (আ .) ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহর ওপরে সমর্পণ করেছিলেন ও প্রত্যাশা করেছিলেন নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন । অর্থাৎ , মূসা বলল , ' এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে রইল । দু'টি মেয়াদের যেটিই আমি পূরণ করি না কেন , তাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে না । আর আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি , আল্লাহ তার সাক্ষী ' । (সূরা কাসাস ২৮) অতএব আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন । এবং মাদাইয়ানের মতো অপরিচিত রাজ্যে সসম্মানের সাথে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন । মু'জেযা যাদুর লড়াই ও ঈমানদারদের ধৈর্যধারণ মূসা (আ .) তার স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে মিসরে ফিরে আসলেন । তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়াত লাভ করলেন ও দুটি নিদর্শন লাভ করলেন । এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে ফেরআউনকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করলেন । কিন্তু অত্যাচারী ফেরআউন কিছুতেই তার দাওয়াত গ্রহণ করলো না বরং সে মূসা (আ .) কে কারাগারে নিক্ষেপের

হুমকি দিল । তখন মূসা (আ .) আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত দুটি নিদর্শন দেখালেন । তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা (আ .) তার হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন । সাথে সাথে লাঠি বিরাট অজগরে পরিণত হলো । তারপর সেটাকে ধরে ফেললেন এবং তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেলো । অন্যটি হচ্ছে বগলের ভিতর থেকে হাত টেনে বের করলেন , সাথে সাথে তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো । এই অলৌকিক ঘটনা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে গেলো । উপস্থিত লোকদের বলে উঠলো : এতো জাদু ! মূসা নিশ্চয়ই একজন দক্ষ জাদুকর হয়ে এসেছে । জাদু দিয়ে সে তোমাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে । মূসা (আঃ) আবার ফেরাউন কে আল্লাহ্ পথে দাওয়াত দিলো কিন্তু সে মূসা আ কে মিথ্যা আরোপ করলো ও এটা কে যাদু বললো ও মিশর এর শ্রেষ্ঠ যাদুকর দের নিয়ে আসলো ও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ও মূসা আঃ একটু ভয় পেয়ে গেলো কিন্তু আল্লাহ্ তার উপর ওহী নাযিল করলেন ও তাকে সান্তনা দিলেন ও লাট মারতে বলেন ও তাতে লাঠিটি বড়ো সাপে পরিনত হলো ও বাকী সব সাপের মতো দেখতে জিনিসকে গিলে ফেলে ও আল্লাহ্ করুণাই মূসা আঃ বিজয় হয় ও জাদুঘর রা তাদের ভুল ভিজতে পারে ও তারা সাজদাহ করে ও তাওবা করে এক আল্লাহ্ উপর ঈমান আনে।

মূসা আঃ ও তার জাতির উপর ফেরাউনের অনেক অত্যাচার করে এর জন্য মূসা (আঃ) ফেরাউনের এই জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তার স্বীয় ভীত- সন্ত্রস্ত কওমকে মূলত দুটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন । ১. শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ২. আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা ।

ফেরাউন যখন মূসা (আ .) ও তার অনুসারীদের আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না , এমনকি সে মূসা (আ .) কে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো । তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো- . b অর্থাৎ , (আল্লাহ বললেন) ‘ তাহলে আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড় ; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে ' । (সূরা দুখান : 23) অর্থাৎ , আর আমি মূসার প্রতি এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছিলাম যে , ' আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে যাত্রা শুরু কর , নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু নেয়া হবে । ' (সূরা শোয়ারা : ৫২

) • অর্থাৎ , আর আমি অবশ্যই মূসার কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে , ' আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় রওনা হও । অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও । পেছন থেকে ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না । এবং ভয়ও করো না ' । (সূরা ত্বহা : ৭৭) আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য । হযরত মূসা (আ .) মুসলমানদের ঘরে ঘরে সংগোপনে খবর পাঠিয়ে দিলেন হিজরত করার প্রস্তুতি নিতে । নির্দিষ্ট রাতের নির্দিষ্ট সময় মূসা (আ .) ও তার সাথীরা একত্রিত হলো । তারপর আল্লাহর নবী মূসার নেতৃত্বে দলেবলে তারা এগিয়ে চললেন ফিলিস্তিনের সিনাই ভূ - খণ্ড অভিমুখে । কিন্তু সামনেই লোহিত সাগর । এ সাগর পাড়ি দিয়েই ওপারে যেতে হবে তাদের । এদিকে ফেরাউনও বসে নেই সে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মূসা ও তার সাথীদের আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল । মূসা (আ .) এর নবুয়তি জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা । ইব্রাহিম (আ .) এর অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় এটিও ছিল জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মহাপরীক্ষা । পিছনে ফেরাউনের হিংস্র বাহিনী , সম্মুখে অথৈ সাগর । এই কঠিন সময়ে বনু ইসরাঈলের আতঙ্ক ও হাহাকারের মধ্যে ও মূসা ছিলেন স্থির ও নিষ্কম্প । দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- “ তারপর তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে তাদের পিছু নিল । অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল , তখন মূসার সাথীরা বলল , অবশ্যই ' আমরা ধরা পড়ে গেলাম ! ' মূসা বলল , ' কক্ষনো নয় ; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন । নিশ্চয় অচিরেইমূসা বলল , তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন ' । অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম , ‘ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর । ' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল । তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল । আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম , আর আমি মূসা ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে উদ্ধার করলাম , তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম । " (সূরা শোয়ারা ৬০-৬৬) সবরের আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে মূসা (আ .) সাগরে লাঠি নিক্ষেপ করলেন । আঘাত লাগতেই সমুদ্রে ঘটে গেলো এক অবাক কাণ্ড । লোকেরা তাদের চোখের সামনে দেখতে পেলো লাঠির আঘাতে সমুদ্রের পানি ফেটে

গেছে । পানিগুলো তরঙ্গের মতো দুই পাশে উঁচু হয়ে পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে গেল । আর সাগরের মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ঠনঠন শুকনো রাস্তা । আল্লাহর নির্দেশে মূসা ও তার সাথীরা এই রাস্তা দিয়ে নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল । এভাবে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল ও মুমিন বান্দাদের সাহায্য করলেন । অপরদিকে ফেরাউন ও তার বাহিনী যখন সমুদ্র পার হওয়ার জন্য শুকনো সমুদ্রের মাঝপথে গেল । তখন আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানি হঠাৎ করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো আর ফেরাউন ও তার দলবল পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগল । এভাবে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ .) এর ধৈর্য , দৃঢ়তা এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থার ফলে তাঁকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করলেন এবং অত্যাচারী জালেম ফেরাউন থেকে তাদের রক্ষা করলেন । আর ফেরাউন ও তার দলবলকে উচিত শিক্ষা দিলেন ।

এখন দেখে নেয়া যাক বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী কঠিন মুহূর্ত গুলো

একদিন রাসূল (সা .) বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করতে ছিলেন । আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা একসাথে বসা ছিল । বিগত দিন একটি উট জবেহ করা হয়েছিল । আবু জাহেল বলল , ' কে উটের ভুঁড়িটি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মাদ যখন সাজদা করবে তার পিঠের ওপর রেখে দেবে । ' তারপর তার দলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি , সে উষ্ট্রের ভুঁড়িটি নিয়ে আসল এবং রাসূল (সা .) সাজদা করলে তার দুই কাঁধের ওপর রেখে তারা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে । তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়লো । আমি পুরো বিষয়টি দেখতে পেলাম , যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো তা হলে আমি রাসূল (সা .) - এর পৃষ্ঠ হতে তা সরিয়ে নিতাম ! রাসূল (সা .) সাজদায় পড়ে রইলেন । কোনো ভাবে মাথা উঠাতে পারছিলেন না । এক লোক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা (রা .) কে সংবাদ দেন । তিনি এই খবর শোনামাত্র দৌঁড়ে আসলেন এবং রাসূল (সা .) - এর মাথা থেকে উটের ভুঁড়ি নামালেন । নামাজ শেষে রাসূল (সা .) উচ্চ আওয়াজে তাদের জন্য বদ দোয়া করতে আরম্ভ করেন । রাসূল বললেন , আল্লাহ

! তুমি কুরাইশদের শাস্তি দাও । ' তিনবার বলেন । যখন তারা রাসূল এর বদ্ দোয়া আওয়াজ শুনতে পেল , তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল । এবং তারা তার বদদোয়াকে ভয় করতে আরম্ভ করে । তায়েফবাসীর সাথে নবী করীম (সা .) নবুয়তের দশম বছরে শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা .) তায়েফবাসীর উদ্দেশ্যে বের হলেন । তার ধারণা ছিল যে , তিনি সকীফ গোত্রে তার দাওয়াতের প্রতি সাড়া ও সাহায্য পাবেন । তার সাথে ছিল আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা । রাসূল (সা .) পথিমধ্যে যে গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন । তবে তাদের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি । যখন তিনি তায়েফে পৌঁছলেন তখন সেখানকার নেতাদের নিয়ে বসলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন । তার দাওয়াতে তারা কোনো ভালো উত্তর দেয়নি । রাসূল (সা .) এখানে দশদিন অবস্থান করেন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকদের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা বলেন । তাতেও ভালো কোনো সাড়া পাননি বরং তারা বলল , ' তুমি আমাদের দেশ থেকে বের হও ! আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলাম না । ' তারা তাদের নির্বোধ ও বাচ্চাদেরকে তার প্রতি ক্ষেপিয়ে তার পিছনে লেলিয়ে দিল । অতঃপর যখন তিনি বের হতে ইচ্ছা করলেন তখন নির্বোধরা তার পিছু ধরল । তারা দু'সারি হয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপ করল । অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল এবং তার অঙ্গ - প্রত্যঙ্গে পাথর নিক্ষেপ করে তার জুতাদ্বয় রক্তে রঞ্জিত করে দিল । আর যায়েদ বিন হারেসা নিজেই রাসূল (সা .) কে রক্ষা করতে ছিলেন । যার কারণে তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল । অতঃপর রাসূল (সা .) তায়েফ থেকে দুশ্চিন্তা ও ভগ্নহৃদয় নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন । মক্কায় আসার পথে আল্লাহ তায়ালা পাহাড় - পর্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাসহ জিবরীলকে পাঠান । সে তার কাছে অনুমতি চাচ্ছিল যে , দুটি পাহাড় যা তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা মক্কাবাসীর ওপর নিক্ষেপ করতে । আয়েশা (রা .) থেকে বর্ণিত , তিনি রাসূল (সা .) কে বললেন , ' হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার কাছে কি উহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষা আরো কোনো ভয়ানক দিন এসেছে ? ' তিনি বললেন যে , আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে যে কষ্ট পাওয়ার তাতো পেয়েছি । তবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি আকাবার দিন ।রাসূল (সা .) - এর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ও দান্দান

মুবারক শহীদ এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে- " সাহল বিন সাআদ (রা .) থেকে বর্ণিত , তাকে প্রশ্ন করা হলো , উহুদ দিবসে নবী (সা .) এর আহত হওয়া সম্পর্কে । তিনি বললেন , ' তার মুখমণ্ডল আহত হলো , এবং তার দাঁতগুলো ভেঙে গেল । বর্মের ভাঙ্গা অংশ তার মাথায় প্রবেশ করল । ফাতেমা (রা .) রক্ত পরিষ্কার করছিলেন , এবং আলী (রা .) রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন । যখন দেখলেন রক্ত বন্ধ না হয়ে আরো বেশি পরিমাণে বের হচ্ছে তখন ফাতেমা চাটাইতে আগুণ ধরিয়ে দিলেন , পুড়ে ছাই হয়ে গেল । অতঃপর তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন , তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল । আর রাসূল (সা .) এ কঠিন কষ্ট বরদাশত করছিলেন । " (সহীহ বুখারি : ২৯১১) যার মহত্ত্বের কাছে পাহাড়ও কেঁপে উঠে । তিনি এমন এক নবী , যিনি এ অবস্থায়ও তার জাতির বিরুদ্ধে বদ - দোয়া করেননি । বরং তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করেছেন । কেননা তারা বুঝে না । আব্দুল্লহ বিন মাসউদ (রা .) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন , এখনো মনে হয় আমি রাসূলের দিকে চেয়ে আছি আর রাসূল (সা .) অন্য কোনো নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন , যাকে তার জাতি মেরেছে । এ অবস্থায় তিনি চোখ থেকে পানি মুছছিলেন এবং বলছিলেন , ' হে আল্লাহ ! আমার জাতিকে মাফ করে দিন তারা বুঝে না । ২২ সমস্ত নবীগণ এবং তাদের মধ্যে সবার উপরে মুহাম্মাদ (সা .) ধৈর্য ও সহনশীলতা , ক্ষমা ও দয়ার মূর্তপ্রতীক ছিলেন । তিনি তার জাতির জন্য ক্ষমা ও করুণার সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন । রাসূল (সা .) বলেন , ' আল্লাহর অভিশাপ ঐ জাতির ওপর অধিক হারে পতিত হয় , যে জাতি তাদের রাসূলের সাথে এ আচরণ করে । এ কথা বলার সময় তিনি তার দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন । আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ কঠোরতর হলো এমন ব্যক্তির ওপর , যে আল্লাহর রাসূল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল । উহুদ দিবসে নবী (সা .) এর আহত হওয়ার মধ্যে দাওয়াত কর্মীদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে ; তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের শরীরে যে কষ্ট বরদাশত করবে , অথবা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা হবে অথবা তাদেরকে যে নির্যাতন করা হবে , সে সকল বিষয়ে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে । ২২. কাহতানী , ড . সাঈদ বিন আলী বিন ওহাব , আনওয়া উস্ সবর ওয়া মাজাল্লাতহু , পৃ : ৪৮-৫৭ । সবরের পুরস্কার নবী (সা .) ছিলেন ধৈর্যের উত্তম আদর্শ । তাকে যখনই কষ্ট দেওয়া হয়েছে

তখনই তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন । কাফিরেরা তাকে শুধু শারীরিক কষ্টই দেয়নি বরং সামাজিকভাবে হেয় - প্রতিপন্ন করা , অর্থনৈতিক ক্ষতি এমনকি মক্কার মর্যাদাবান ব্যক্তি হয়েও তাকে ও পরিবারকে বন্দী জীবন - যাপন করতে হয়েছে । কিন্তু কোনভাবেই তারা রাসূল (সা .) কে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত থেকে পিছু হটাতে পারেনি বরং তিনি অবিচলতা , দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতার যে অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন , পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

সবরের পুরষ্কার

শত কষ্টের মাঝেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে , হোক সেটা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে , অথবা সেটা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা বিপদাপদ অবস্থায় । আল্লাহ তায়ালা তার জন্য উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন । তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- জান্নাতে প্রবেশ ও রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ মুমিন ব্যক্তিদের পার্থিব জীবন হচ্ছে ধৈর্য বা সবরের জীবন । কারণ ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা চলার পথে নিজের অবৈধ আশা - আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা , আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা , আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা , আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সময় , অর্থ - সম্পদ , শ্রম , শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা , আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ - লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা , সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ - কষ্ট আসে তা সহ্য করা , ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ - কষ্ট এসে আঁকড়ে ধরে তা বরদাশত করা এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে । সে সকল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতি রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে- (অর্থাৎ , আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল

তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন । (সূরা দাহর : ১২) অন্য আয়াতে তাদের জন্য রোদ্রের উত্তাপ ও তীব্র ঠাণ্ডা বিহীন উঁচু আসনে বসার সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে । যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন- অর্থাৎ , তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে । তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম , আর না অত্যধিক শীত । (সূরা দাহর : ১৩) জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ এ সকল মুমিন বান্দাদেরকে জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাগন সালাম দেবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সুখবর দিবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-অর্থাৎ , (আর বলবে) ‘ শান্তি তোমাদের ওপর , কারণ তোমরা সবর করেছ , আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম ' । (সূরা রাদ : ২৪) ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান সবরকারী ব্যক্তি তো সেই যে কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে । সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না । বরং সব অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলে । যদি কখনো অবস্থা অনুকূল এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা , কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না । আর যদি কখনো বিপদ - আপদ ও সমস্যা - সংকটে করাল আঘাত ক্ষত - বিক্ষত করতে থাকে , তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না । আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ - মুসীবত যে কোনো আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায় তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে । তার হৃদয়পাত্র কখনো কোনো ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না । আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদের দোষ - ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কার প্রদান করেন । যেমনিভাবে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- অর্থাৎ , তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে , তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান । (সূরা হুদ : ১১) অগণিত পুরস্কার যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার অবলম্বন করেছে । দুনিয়ায় আগত বিপদ - আপদের সময় ধৈর্যধারণ করেছে ও তাকদীরের ভাল- মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে , সে সকল

বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরষ্কারের কথা বলা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-অর্থাৎ , বল , ' হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ , তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর । যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ । আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত , কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসেব ছাড়াই । ' (সূরা যুমার : ১০) ঈসা (আ .) এর অনুসারী যারা জাতীয় , বংশীয় , দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিল এবং দ্বীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং তারা আল্লাহর পূজারী ছিল । তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । আর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন । যেমন কুরআনে এসেছে- অর্থাৎ , তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে । এ কারণে যে , তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে । আর আমি তাদেরকে যে রিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে । (সূরা কাসাস : ৫৪) নেতৃত্ব প্রদান ধৈর্য ও অবিচলতার মাধ্যমে যে নেতৃত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় , তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল । আল্লাহর আয়াতের প্রতি তাদের যে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন তার ফলশ্রুতিতে তারা শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছিল এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল । বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনের সীমা ছাড়িয়ে যেত না । তাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হচ্ছে- অর্থাৎ , আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম , তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত , যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত । (সূরা আস্সাজদাহ : ২৪) সবরের পুরস্কার বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে । আল্লাহ তায়ালা সে সকল মুমিন ব্যক্তিদেরকে বিপদ - মুসীবত

সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন - অর্থাৎ , হে মুমিনগণ , ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও । নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন । (সূরা বাক্বারা : ১৫৩) শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও শত্রুর হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কেউ যদি দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায় । আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিদান করেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করে দেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন- অর্থাৎ , যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে , তখন তাদের কষ্ট হয় । আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে , তখন তারা তাতে খুশি হয় । আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর , তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না । নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে , তা পরিবেষ্টনকারী । (সূরা আলে ইমরান : ১২০) আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেমন- ভীতি , ক্ষুধা , প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি , উপার্জন ও আমদানি হ্রাস ইত্যাদি পরীক্ষার সময় যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে । সে সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও হিদায়াত দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে । যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে- অর্থাৎ , আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও । যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে , নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী । তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত । (সূরা বাক্বারা : ১৫৫-১৫৭) আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন

অর্থাৎ , আর কত নবী ছিল , যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে । তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি । আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি । আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন । (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬) আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করে না বরং ধৈর্যসহকারে তার চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেয় এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চায় । এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও তাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করা

হয় । যা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত , আমরা হযরত আইয়ুব (আ .) এর জীবনে দেখতে পাই । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- অর্থাৎ , আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর । আর কসম ভঙ্গ করো না । নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি । সে কতই না উত্তম বান্দা ! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী । (সূরা সোয়াদ : ৪৪) শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অবস্থায় লড়াই করে । সকল প্রকার ত্যাগ - কুরবানি ও দুঃখ - কষ্ট সহ্য করে । সে সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন । যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন । যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে- অর্থাৎ , হ্যাঁ , যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর , আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায় , তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন । (সূরা আলে ইমরান : ১২৫) আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম , যেখানে আমি বরকত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো । কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছে । আর ধ্বংস করে দিলাম , যা কিছু তৈরি করেছিল ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল । (সূরা আরাফ : ১৩৭) জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

প্রিয়জন বিয়োগে যারা ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করে । সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বাইতুল হামদ বা প্রশংসার গৃহ নির্মাণ করবেন । এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা .) বলেছেন- “ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা .) বর্ণনা করেন , রাসূল (সা .) বলেছেন , যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো ? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ । আল্লাহ বলেন - তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ ? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ । আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তো আমার বান্দাহ কি বলছে ? তারা জবাব দেয় সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে । এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন , তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং

তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো । ” (রিয়াদুস সালেহীন : **১৩৯৫**)
পরিশেষে , মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা , হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর , যারা বিপদ - মুসিবত , দুঃখ - কষ্টে সবর করে । যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে । হে রব ! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও , যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী । আমীন